আশ্বিনের মাঝামাঝি

শিবাজীপ্রতিম বসু

সেই যে মধু আর তার ভাই বিধু...

সেই যে আশ্বিনের মাঝামাঝি 'পূজার সময়' কাছে এলে, বাজনা বেজে উঠলে, যারা আনন্দে দু'হাত তুলে নাচতে নাচতে বাড়ি গিয়ে পুজোর উপহার দেখতে যেত, আর মধু, বাবার আনা সস্তা ছিটের জামা, ধুতি-চাদর দেখে— তাদের উল্টোপিঠ— বড়লোকের ছেলে গুপির বৈভব— জরির টুপি আর ফুলকাটা সাটিনের জামার কথা ভেবে রেগে আগুন হয়ে যেত; শেষে মধু, গুপির কাছ থেকে পাওয়া, দামি জামা পরে ফাঁকা কাপ্তেনি করত আর বিধু বাড়ির দেওয়া জামাকাপড়েই খুশি থাকতো... সেই মধু-বিধু এখন কোনো টাইম মেশিনে চড়ে কিংবা নিছক ধুস্তুরি মায়ায় সল্টলেকের রাস্তায় সিটি সেন্টারের সামনে...

বিধুর কাঁধে এক বিপুল গাঁটরি— গত একশো বছর ধরে পাওয়া দু'ভায়ের— ২×১০০— দুশো সুতির ছিটের জামা, নানা ধুতি-চাদর দিয়ে কষে বাঁধা।... চারদিকে আলোর ফোয়ারা, কাচের দেওয়ালের ওপার থেকে দৃশ্যমান থরে-বিথরে সাজানো অযুত-অবুঝ পণ্যসম্ভার, বিচিত্রবেশী ও কেশী আত্মমগ্ন/জগৎ-নির্লিপ্ত মানুষজনের মৃদু বাক্যালাপ ও দৃপ্ত হেঁটে যাওয়া, তাদের চলে-যাওয়া-হাওয়ায়-ভাসা পাগলকরা সুবাস... তারা কি কন্দর্পলোকে পৌঁছে গেল?

কিন্তু কন্দর্পলোকের দুয়ার আগেল দাঁড়িয়ে আছে এক সাক্ষাৎ চেরী-রমণী ও এক যমপুরুষ। তারা তো ঢুকতে দিলই না উল্টে এমন তাড়া করল যে গাঁটরি মাথায় দুই ভাই চলন্ত গাড়ির রাস্তা পেরিয়ে একটা গলিতে ঢুকে পড়ল।... এতক্ষণ সিটি সেন্টারের মোহিনী মায়ায় এমন বুঁদ ছিল যে খেয়াল করেনি, কিন্তু এবার তারা বুঝলো, একদম অন্য জগতে, অন্য সময়ে চলে এসেছে। এদের মধ্যে মধু শৌখিন, বেহিসেবি— আয়-ব্যয়ের চিন্তা নেই, সাংসারিক-বোধ কম, কিন্তু বহির্জগত সম্বন্ধে জ্ঞান অনেক বেশি, আর বিধুর সাংসারিক-জ্ঞান অনেক বেশি, গরিব বাবা-মায়ের সাধ্য-অসাধ্য তার জানা, তাই সে অনেক নিজ-জগৎমুখী— আদার ব্যাপারি সে, জাহাজের খোঁজ রাখে না...

তাই আশেপাশের চলতি গাড়ির মিছিলে দু'জনেই ঘাবড়ে গেলেও, মধু, একটু মাথা ঠান্ডা হলে বুঝলো, এগুলো হল, কলকাতা থেকে আসা তাদের থার্ড-ক্লাসের ছোকরা ইংরেজির মাস্টার বিজনবাবুর (বিলিতি কাগজ থেকে) দেখানো, জর্মনির কার্ল বেঞ্জ-এর বানানো আদি অটোমোবাইলের বহু পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত, বিপ্লবাত্মক নব সংস্করণ, যার কিছুটা হদিস বিজ্ঞান-ভক্ত বিজনবাবু দিয়েছিলেন। বিদেশে নাকি ঘোড়ার গাড়ির কোচে ইঞ্জিন লাগিয়ে একাধিক মানুষ যাতায়াতও করছে, ঘোড়ার গাড়ির চেয়েও বেশি গতিতে, জানিয়েছিলেন তিনি। যদিও তাদের এমন প্রাণঘাতী গতির কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না! কিন্তু চারপাশের বড় বড় নানা আকার ও রঙের বাড়িঘরের কোনও

তুলনা সে পেল না— ভূগোলের বইতে সে লন্ডন শহরের ছবিতে অনেক বড় বড় অট্টালিকা-প্রাসাদ দেখেছে বটে, কিন্তু ঠিক এমন ধারা নয়।... গলির মধ্যে খানিকদূর গিয়ে মধু এমন একটা গাড়ি দেখল, যার কাছাকাছি কিছু গাড়ি সে একবার, বাবার সঙ্গে মহাজনের সেরেস্তায় যাওয়ার সময়, জেলাসদরে দেখেছে— বস্তুটির নাম, 'বাইসিক্ল'! একটা লোক, তাদের চেয়ে ছোট একটা কাপড়ের পুঁটুলি 'বাইসিক্লের' কেরিয়ারে চাপিয়ে, গাড়ির হ্যান্ডেল ঠেলে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। মধু তার পিছু নিল। আর বাইরের ব্যাপারে চিরদিন মধুর নেতৃত্ব মেনে চলা বিধু, মাথায় গাঁটরি নিয়ে প্রায় চোখ বুজে মধুর পিছু নিল।

খানিক চলার পর, সাইকেল-বাহকের কী মনে হল, পিছু ফিরে দেখে, দুই অদ্ভুত পোশাকি দেহাতি আদমি, একজনের মাথায় বিরাট গাঁটরি, তার পিছু নিয়েছে। যদিও এই অঞ্চলে সে বছর পাঁচেক কাজকর্ম/ বসবাস করছে, তবু আশ্বিনের মাঝামাঝি, সন্ধে হওয়ার মুখে, সল্টলেকের প্রায় নিঃঝুম রাস্তায়, তার একটু শিরশিরানি লাগলো, আর তা ঢাকা দিতেই সে হেঁকে উঠল— কওন হ্যায় রে?...

লোকটির নাম 'পবন'। ছত্তিসগড়ের বিলাসপুরে বাড়ি, সল্টলেকের অন্যান্য অঞ্চলের মতো, সিটি সেন্টারের সামনের ব্লকে, একটা পার্কের গায়ে কাঠের গাড়িতে, বাড়ি-বাড়ি থেকে জামাকাপড় সাইকেলে বয়ে এনে ইস্ত্রি করে, আবার ইস্ত্রি হওয়া পাট-পাট জামাকাপড় সাইকেলে চাপিয়ে লোকের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয়।... পবনের আওয়াজে মধু একটু চমকে গেছিল, কিন্তু মনে পড়ল, তাদের ইস্কুলের দারোয়ান, পাঁড়েজি— জব্বলপুরের মানুষ, এমনি ভাষায় কথা বলত বটে, তার সঙ্গে হিন্দুস্তানিতে কিছু কিছু বাৎচিত সেও চালিয়েছে, সেই জ্ঞানের ভিত্তিতেই যতদূর সম্ভব কাতর-কণ্ঠে বলল, ভাইয়া, হামলোগ গাঁও সে আয়ে হ্যায়...।

ইতিমধ্যে পবন দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার কাছে যেতে যেতে মধু স্থির করল, রাত হয়েছে— কোথাও একটা কাটানোর উপায়, কিছু দানাপানির ব্যবস্থা করতে হবে। অতপর, সত্যমিথ্যা ও হিন্দুস্থানি-বাংলা মিলিয়ে সে বলল, যে তারা গরিব লোক— শহরে 'মাল' পৌঁছতে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছে, এখন রাতটা কোথাও যদি...।

বলতে বলতে তারা ইস্ত্রি-গাড়ির সামনে চলে এসেছে। পার্কের গা ঘেঁষে কিছুটা চওড়া ফুটপাতের ওপর কাঠের গাড়িটা তোলা, তাই গাড়ি যাতায়াতের অসুবিধা হয় না, আর সল্টলেকে ব্লকের ভেতরকার গলিতে বিশেষ করে 'ফুটে' ওঠে না, আর পার্কের দেওয়াল-ঘেঁষা বলে বাড়ির লোকজনদেরও আপত্তি নেই— ফলে, পথচারী/ শকটগামী/ গৃহবাসী কারও বিরক্তি না ঘটিয়েই, এমন ইস্ত্রি-গাড়ি এখানে ব্লকে-ব্লকে টিকে আছে। এটা সেইরকমই একটা গাড়ি— যার ওপরের ফ্রেমের সঙ্গে একটা মোটা-কালো পলিথিনের চাদর টেনে গাড়ির মাথা থেকে উঁচু করে পার্কের দেওয়ালের সঙ্গে আটকে একটা চালা রচনা করেছে— পবনের চালা। এখানেই শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা তার দিন গুজরান— ইস্ত্রি হয়ে গেলে, তার কয়লার তোলা উনুনের আঁচে সরল রন্ধন, আর কাছের বাজারের গণ-'বাথরুমে' স্নানাদি প্রাকৃতিক কাজ সমাপন।... গাড়ির কাছে পৌঁছবার আগেই মধু,

বিধুর কানে ফিসফিসিয়ে বলে দিয়েছে, দেশ-কালের গণ্ডি পেরিয়ে তাদের এখানে আসার কথা যেন ভুলেও সে কারও কাছে ফাঁস না করে। বিধু কী বুঝেছে কে জানে, কিন্তু মাথা নেড়েছে।

গাড়ির পাটাতনের ওপর ইস্ত্রির কাজ চলছে— একজন রোগাসোগা চেহারার লোক কাপড়ে জল ছিটিয়ে ইস্ত্রি করছে। পবন বলল, হামার শালাবাবু, রামরতন। ভিলাই মে উসকা আপনা ঘর, লেকিন এখন থাকে জগদলপুরে, সসুরা কা ঘর। একটা মুসিবতে হপ্তাখানেক এখানে এসেছে, আগলা সোমবার রাতের গাড়িতে ফিরে যাবে। পবনের কথায় উক্ত 'রামরতন' অধোবদন হয়, কিন্তু সেদিকে দৃকপাত না করে পবন কাজের কথা শুরু করে। মধু-বিধুকে সে দু'একদিন তার কাছে 'পনহা' দিতে পারে— কিন্তু তাদের খাওয়া-দাওয়া-খরচাপানির জন্য কিছু রেস্ত তো লাগবে, তার কী হবে? কিন্তু মধু-বিধুর কাছে তো টাকাকড়ি নেই! তখন দয়াপরবশ পবন জানায়, কুছ পরোয়া নেই— আগলা রবিবার সকালে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ-এম. জি. রোডের ক্রসিংয়ে, সেকেন্ড হ্যান্ড কাপড়ের বাজারে, পচাস রুপাইয়া কিলো দরে বস্তাসুদ্ধু বেচে দেওয়া হবে, মালুম হচ্ছে করিবন পচাস কেজি মাল আছে, তো সেই হিসাবে কম-সে-কম ঢাই হাজার রোকরা পাওয়া যাবে। তবে হাঁ, তার মধ্যে পবনকে হাজার রুপাইয়া দিতে হবে! তার আগে তারা দু-একদিন তার কাছেই থাক, খানাপিনা করুক, শহর দেখুক, মওজ-মস্তি করুক। কিন্তু এখন তাকে বেরোতে হবে, বাজার সে কুছ সামান-আমান আনতে হবে, হাজার হোক, অতিথি বলে কথা!...

পবনের প্রস্তাবে মধু হাতে চাঁদ পেল। এই জায়গা আর পবনকে তার পছন্দ হয়েছে, সে হাঁ করে রামরতনের ইস্ত্রি করা দেখতে লাগল— এই বস্তুটি সে গুপিদের বাড়িতে দেখেছে। সে বরাবরই ফিটফাট শৌখিন মানুষ, কতদিন ভেবেছে, তাদেরও যদি এমনটা থাকতো!... কিন্তু আচমকা তার চোখ পড়ল, একটা ইংরেজি পুরোনো খবরের কাগজের পাতায়— যা দিয়ে কয়েকটা ইস্ত্রি-হওয়া জামা মোড়া আছে। তাতে বড় বড় হরফে লেখা: 'প্রাইম মিনিস্টার মোদি কিপস্ সাইলেন্স অন ললিত মোদি'। কিন্তু, মধু ভাবে, এখন 'প্রাইম মিনিস্টার' তো মিঃ ক্যাম্পবেল-ব্যানারম্যান, তার আগে মিঃ ব্যালফোর...। এই 'মোদি'টা কে? কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ না করে সে পড়ে যেতে লাগল। আর তার একমনে পড়ে যাওয়া দেখে পবন আর রামরতনের বিস্ময়ের শেষ নেই। আই বাপ, তু আংরেজি পড় লেতা? তব তো রামরতন কা চিন্তা নহি। এ রামরতন, তু মধুবাবু কো আপনা পর্চা দিখা। হামি ততক্ষণ বাজার ঘুরে আসি।

পবনের মুখে 'বাবু' ডাক শুনে এবার মধুর অধোবদন হওয়ার পালা। বাবা টাকা যোগাতে না পারায় যখন এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়া হল না, তখন থেকে সে গুপির বাবা, রায়বাবুর সেরেস্তায় খাতা লেখার কাজ করে। গুপির বাবার বিরাট ব্যবসা, জমি-জিরেত, ওদিকে শহরের কলেজে পড়তে গেলেও গুপি একটা নিষ্কর্মা ফান্টুশ তৈরি হয়েছে। রায়বাবু মধুকে বেশ পছন্দ করেন। তার প্রায় নির্ভুল ইংরেজি, মুক্তোর মতো হাতের লেখার প্রশংসা করেন। সেরেস্তায় থাকতে থাকতে তার জমি-জিরেতের ব্যাপারে বেশ জ্ঞান হয়েছে।

এছাড়া অবসর সময়ে, সেরেস্তায় রাখা, কলকাতা থেকে আনা 'দ্য স্টেটসম্যান' পড়ে তার ইংরেজি-জ্ঞান আর দেশ-বিদেশ সম্বন্ধেও জানাশোনা বেড়েছে।...

এদিকে পবনকে বাজার যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে দেখে বিধু উশখুশ করতে লাগল। উৎসব-পাবনে তাকে কেউ বাড়ি বসিয়ে রাখতে পারে না। আর একটু আগেই সিটি সেন্টারের কন্দর্পলোকের নানা বিপণীতে সে শোলার দুর্গাঠাকুরের মুখ আর ঢাকিদের ছবি দেখেছে— ওখানে না যেতে পারলে তার জীবনই বৃথা! মধুকে সে কথা কানে কানে বলতে, মধু পবনকে বিধুর বাসনা বুঝিয়ে বলে। পবন তার দিকে তাকিয়ে বলে, এই মনহুস কাপড়ামে তু সিটি সেন্টার ঘুরবি! ঠিক হ্যায়, তু পারকের পিছে গিয়ে ওই কালা প্যান্টটা পহন, তারপর তোকে লিয়ে যাচ্ছি, বলে ইস্ত্রির জন্য রাখা একটা কালো প্যান্ট ছুঁড়ে দেয়। ... একটু পরে বিধু যখন ফিরে আসে, তখন মধু দেখে, কালো প্যান্ট আর ডোরাকাটা সুতির কলারওয়ালা বাংলা পাঞ্জাবিতে তাকে মানিয়েছে বেশ।

পবনের সঙ্গে বিধুর উচ্ছবল চলে যাওয়া দেখছিল মধু, হুঁশ ফেরে রামরতনের কথায়। ই দেখিয়ে বাবুজি, চিঠঠি। আগলা মাহিনেকা দশ তারিখ তক জমিন খালি করনেকা লুটিশ। মধু দেখে, একটা ময়লা, বহু ভাঁজ করা, প্রায় ছিন্ন কাগজে লেখা: 'দ্য চিত্রকূট ওয়াটার রিফাইনারি অ্যান্ড ইকো ট্যুরিজম কোঃ প্রাইভেট লিমিটেড'। এই কোম্পানির পক্ষ থেকে ছত্তিসগড়ের বস্তার জেলার পোটানার, বদনজি ও আরও বেশ কয়েকটি গ্রামের অধিবাসীদের শেষবারের মতো জানানো হচ্ছে যেন আগামী ১০ তারিখের মধ্যে তাদের জগদলপুরের অফিস থেকে তাদের পরিবারপিছু প্রাপ্য বিশ হাজার টাকা নিয়ে তাদের বেআইনিভাবে 'দখল' করা সরকারি জমি খালি করে দেয়, কারণ, এইসব অঞ্চল আদতে সরকারের খাস জমি, যা এই কোম্পানি বিধিপূর্বক সরকারের কাছ থেকে নিরানব্বই বছরের জন্য লিজ নিয়েছে।... কোম্পানি আরও জানাচ্ছে যে, এর বদলে কেবল আর্থিক ক্ষতিপূরণই নয়, পরিবারপিছু 'সক্ষম' যেকোনও একজনকে কোম্পানির বিভিন্ন প্রকল্পে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। কিন্তু যদি ১০ তারিখের মধ্যে...। বয়ানের শেষের অংশটা মধুর আগে থেকেই জানা, রায়বাবুর জন্য সে বহুবার এমন চিঠির মুসাবিদা করেছে। বিশেষ করে, উচ্ছেদের মামলায় জিতে এমন চিঠি দেওয়াই দস্তুর। এরচেয়েও কড়া চিঠি সে অবশ্য দেখেছে যখন নতুন রেললাইন পাতার জন্য সরকারবাহাদুর, ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন মোতাবেক, তার মামার বাড়ির জমি খালি করতে এক সপ্তাহের কম সময় দিয়েছিল।... রামরতন জানায় এই কোম্পানির মালিক, জালান সাহিবের বাংলা কলকাতার আলিপুরে, তাই তার এখানে আসা, যদি 'মাঈ-বাপের' পায়ে পড়ে কিছু সুরাহা হয়। কিন্তু গত এক হপ্তার লাখ কোশিশ কা বাবজুদ কিছু হয়নি।

এসব শুনতে শুনতে মধু একটু আনমনা হয়ে গেছিল। হঠাৎ তার নজরে পড়ে চিঠির তারিখ: '০৫/০৯/২০১৫'। '২০১৫'?!! তার মানে: কেবল কয়েক বছর নয়, একশো বছরের বেশি সময় পেরিয়ে এসেছে তারা! তাই সব অন্যরকম ঠেকছে! খুব তাড়াতাড়ি এই নতুন দেশ আর বিশ্ব সম্বন্ধে জেনে না নিলে পদে পদে ঠোক্কর খেতে হবে। কিন্তু সবার

আগে জানতে হবে এই 'ছত্তিসগড়'টা কোথায়? এ ব্যাপারে রামরতন ভালোভাবে কিছু বোঝাতে পারলো না। সে খালি বলে, তার শ্বশুরদের পরিবার পোটানারের কাছের ছোটা ঝোড়ার কাছে সদিয়োঁসে আছে। শ্রীরামজির সময় সে। জানেন তো, চিত্রকোটে শ্রীরামজি, সীতা মাইয়া আর লছমন ভাইয়া এসেছিলেন, বনবাসের সময়। ওহি জাগহ কা লড়কি, হামার জরু। ওর পিতাজি আগে ভিলাইয়ে কাজ করত। ওখানেই ভাবসাব হয়। কিন্তু জাতে 'গোণ্ড'-হামার ফেমিলি এই শাদি মেনে নেয়নি।... এ কথা মধু ভালোভাবেই বুঝল। তাছাড়া, ছোটবেলা থেকেই রামায়ণে সে চিত্রকূটের কথা শুনেছে, যদিও এতদিন ভেবে এসেছে— তা নিছকই গল্প-কথা। কিন্তু সে আবার জিজ্ঞেস করে, 'ছত্তিসগড়'টা কোথায়? বাবুজি, যো পহলে মধিয়াপরদেস, ওহি অব ছত্তিসগড়। কিন্তু, এই মধ্যপ্রদেশটাই বা কোথায়? সে জানে, কার্জন সাহেব একবার বাংলার পশ্চিমভাগকে কেটে সিপি অ্যান্ড বেরার, মানে সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস আর বেরার-এর সঙ্গে জুতে দিতে চেয়েছিলেন। সেটাই কি রামরতনের 'মধিয়াপরদেস'? এসব জানার জন্য ভালো একটা অ্যাটলাসের ম্যাপ চাই।... এব্যাপারে তার চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল। কারণ, হই-হই করতে করতে, বা বলা যায়, প্রায় নাচতে নাচতে বিধু আর পবন ফিরে এল।

দুজনেই দারুণ উত্তেজিত— এক সঙ্গে বলতে চাইছে, তাই কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তখন মধু, বিধুকে থামিয়ে, পবনকে বলতে বলল। জানা গেল, কাছের মুদিখানা থেকে চাল-ডাল-তেল-ডিম-আলু কিনে পবন বিধুকে নিয়ে সিটি সেন্টার যায় (এবার অবশ্য কেউ বিধুকে আটকায়নি)। বিধু ভেবেছিল, ভেতরে ঠাকুরের মূরত বানানো হচ্ছে। কিন্তু দু'একটা দোকানে ঠাকুরের মুখ থাকলেও প্রতিমার দেখা মেলেনি। তখন পবন তাকে নিয়ে ফিরে আসতে চায়, কিন্তু বিধু নাছোড়বান্দা— পুরো 'মেলা' না দেখে যাবে না। অগত্যা তাকে নিয়ে পবন সিটি সেন্টারের এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো ঘুরে বেড়ায়: যা দেখে বিধু তাতেই বিস্ময়— পুরোনো ঘোড়ায় টানা ট্রামের আদলে করা স্টোর আর তার সামনে ঘোড়া আর সহিসের বিলকুল আসলি দেখতে পুতলাদের তো বিধু সত্যি ভেবেছিল, পরে কাছে গিয়ে বুরবক! একতলা দেখে শখ মেটে না— 'নাগরদোলা' সিঁড়ি চড়ে দোতলায় যাবে, সেখান থেকে তিনতলায়। এইভাবে 'ঘুমতে ঘুমতে' তারা পৌঁছয় তিন তলায় 'মল-ইন-মল'-এ— সেখানে ছোট-ছোট হরেক কিসিমের দুকান। হঠাৎ একঠো কাপড়াকে দুকান সে এক অল্পবয়সী ম্যাডাম বেরিয়ে এসে তাদের ভেতরে ডাকে। দুকানের নাম আন্টিকা।... পবনের বলার মাঝেই বিধু মধুকে একটা কার্ড দেয়, তাতে লেখা:

অ্যান্টিকা

আ হাউজ অফ কোয়ালিটি অ্যান্টিক ড্রেসেস

ডিজাইনার: নীলম মাথুর

মল-ইন-মল

সিটি সেন্টার, সল্টলেক

পবন বলে, তো, এই ম্যাডামতো বিধুর জামা দেখে একেবারে ফ্যালাট— বলে কোথা থেকে এই জামা কিনেছে, কত দাম? তো, বিধুয়াতো একদম বুদ্ধু, বলল, দেড় রুপাইয়া! নেহাত আমি সামলে দিলাম, বললাম, মানে উনি বলতে চাইছেন, দেড় হাজার রুপাইয়াতে উনি এই এক পিস বিক্রি করেন। শুনে তো ম্যাডামজি তাজ্জব— বিক্রি করেন, মানে বিজিনেসম্যান? কোথায় দুকান, কত স্টক, এইসব নানা সওয়াল। এইবার বিধুয়ার বুদ্ধি খুলল, বলে, হামরা দূর সে আয়েঁ, আমাদের কাছে এমন জামা অনেক আছে...। তখন উনি বললেন, দেখুন, এহি তুকান আমার এক রিলেটিভের, যো বাহর রহতা হ্যায়। এখন হামি চালাই। বাজার মন্দা— তার উপর দুকান ভাড়া, ইলেকট্রিক আর কাজের লোক মিলিয়ে মাহিনামে সোলা সে আঠারা হাজার। কোন মতে চলছে।... এখন আসলি কটন কাপড়া কা চিজ-এর দাম আছে— আর এমন পুরানা ইস্টাইল হলে মাল জরুর বিকবে, তবে দেড় হাজার নয়, বারা শও করে বেচলে, লোকে শপারস' স্টপ ছেড়ে এখান থেকে লাইন দিয়ে খরিদবে। উনি তার উপর কিছু ডিজাইন ভি ডালবেন। দুকান চালানোর খরচা ভি ওনার। তাই উনি পিস পিছু চার শওএর জাদা দিতে পারবেন না। বিধুয়া ত তাতেই রাজি। ত, হামি বললাম, চার-শওতে নুকসান হয়ে যাবে। তখন ম্যাডামজি বলল, ঠিক হ্যায়, পাঁচ শও।... কাল দুপুর তিনটেয় বিশটা নমুনা নিয়ে যেতে হবে— যদি পসন্দ হয় তো, ফিফটি পার সেন্ট, ইয়া নেই, পাঁচ হাজার অ্যাডভান্স। আর মাল নিয়ে যাওয়ার টেক্সি ভাড়া ভি দিয়েছে দো শও।... আরে মধুবাবু আর বিধুয়া তুম লোগতো বহত লাকি হো ইয়ার!...

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর, শুতে শুতে মধু ভাবল, তাদের, বিশেষ করে বিধুর একটা হিল্লে হয়ে গেল। আসলে, বাবা মারা যাওয়ার পর, সে অনেক বদলে গেছে। লেখাপড়ায় খাটো এই ছোট ভাইয়ের দায়িত্ব তার ওপরেই। ভাইকে সে ভালোবাসে। হঠাৎ তার মনে পড়ল, রামরতনের সমস্যার কথা। সে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা পবন, এখানে অ্যাটলাসের ম্যাপ কোথায় পাওয়া যাবে? ঘুমজড়িত গলায় পবন বলল, কাল সব দেখা যাবে।...

পরদিন সকাল থেকে ইস্ত্রি-যজ্ঞ শুরু হয়ে যায়। একটা ইস্ত্রি নিয়ে রামরতন দোকানের জামাকাপড় 'রেডি' করছে, আর একটা দিয়ে পবন আর বিধু গাঁটরি থেকে নানা নকশার কুড়িটা জামা বের করে টানটান করে পাটে পাটে ইস্ত্রি করছে। এমনকি পবন মধু-বিধুর জামাও খুলে নিয়েছে। মধুকে তার নিজের একটা লাল টি শার্ট আর জিন্সের প্যান্ট আর বিধুকে তার কালো প্যান্টের ওপর আকাশি নীল জামা দিয়েছে।... জলখাবার-চা হয়ে গেছে। প্রায় এগারোটা বাজে, ইতিমধ্যে মধু বার দুই পবনকে ম্যাপের কথা বলেছে।

সোয়া এগারোটা নাগাদ একটি মেয়ে— কাঁধে ঝোলা আর হাতে কয়েকটা কাচা কাপড়— এসে পবনকে কাপড়গুলো দিয়ে বলল, বিকেলে ফেরার সময় নিয়ে যাবে।

মেয়েটির নাম তিন্নি— কাছেই থাকে, প্রেসিডেন্সিতে পড়ে। পবন তাকে বলল, এ তিন্নি দিদি, আপ তো বড়া কালিজ মে পড়তি হো, এই আমার ভাইয়া গাঁও সে আয়া, লেকিন আংরেজি জানতে হ্যায়। ইন কো এক কিতাব চাহিয়ে, আপ বাতা সাকতি হো... ইতিমধ্যে মধু এসে দাঁড়িয়েছে। পবনকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল, ম্যাডাম, মে আই হ্যাভ

দ্য প্রিভিলেজ টু আস্ক ইউ, হোয়ার ক্যান আই অবটেইন অ্যান অ্যাটলাস ম্যাপ অফ ইন্ডিয়া?...

মধুর কথায় মেয়েটি এক মুহূর্ত চেয়ে রইল, তারপর হো হো করে হেসে উঠল। তাই দেখে কাচুমাচু মধুকে দেখে, পরে সামলে নিয়ে বলল, অফ কোর্স, আই ক্যান টেল ইউ। আপনি বাঙালি? কাছেই সিটি সেন্টারের ওপরে বইয়ের দোকান, স্টার-মার্ক, আমিও এখন ওখানে যাচ্ছি, পরে কলেজ যাবো। চলুন, ওখানেই সব পেয়ে যাবেন। ... যাবার আগে পবন মধুর হাতে দুশো টাকা গুঁজে দিল।

রাস্তায় যেতে যেতে, তিন্নি জিজ্ঞেস করল, ম্যাপ কেন লাগবে? তখন মধু, যতদূর সম্ভব নিজেদের পরিচয় চেপে, রামরতনদের সমস্যার কথা বলতে লাগলো, আর সেসব কথা শুনতে শুনতে, তিন্নি কেমন একটু সিরিয়াস, ঈষৎ গম্ভীর হল।...

অ্যাটলাসের ম্যাপ খুলে মধু তার নবলব্ধ স্ক্র্যাপবুকে পেন্সিল দিয়ে নানান তথ্য লিখতে লাগল। এই খাতা আর পেন্সিল— দুটোই তিন্নির দেওয়া। এই দোকানে তার সবাই চেনা, তাই বলে গেছে, এখানে যতক্ষণ খুশি মধু, কোনও বই না কিনে, বই দেখতে পারে। সে আরও বলে গেছে, বিকেলে ফেরার সময় পারলে দেখা করবে।... তারপর থেকে মধু ঘণ্টা-দুই এই বইয়ের রাজ্যে হারিয়ে গেল। এত বই একসঙ্গে সে আগে দেখেনি। তার খুব লোভ হচ্ছিল, দু'একটা নাম-জানা-কিন্তু-না-পড়া সাহিত্যের বই দেখে, কিন্তু তার এই মুহূর্তের কর্তব্য তাকে বিরত করল। সে বেছে বেছে ভারতের আধুনিক ইতিহাস ও রাজনীতির বেশ কিছু কথা টুকে রাখল। বেরবার সময় সে যখন দুশো টাকার মধ্যে দুটো বই কিনতে পারল, তার ভারি আনন্দ হল। বইগুলো হল: ফরেস্ট কমিউনিটি রাইটস ইন ইন্ডিয়া— আ হ্যান্ডবুক এবং এম কে গান্ধীর লেখা, সত্যাগ্রহ ইন সাউথ আফ্রিকা।...

ফিরে এসে দেখে পবন, বিধু আর রামরতন চারটে বড় সুদৃশ্য প্লাস্টিকের ব্যাগে ইস্ত্রি করা জামাগুলো ঢোকাচ্ছে— পবনের যত্নে আর কায়দায় এতদিনকার অবহেলার জিনিসগুলো দেখতে নতুন আর সুন্দর লাগছে। পবনরা চলে যেতে মধু তার টুকে আনা নোটস্, রামরতনদের নোটিশ আর সবুজ রঙের 'ফরেস্ট রাইটস্'-এর বইটা খুঁটিয়ে, দাগ দিয়ে পড়তে লাগল। পাশে রামরতন ভাতঘুম দিচ্ছে, তারও একটু তন্দ্রা এল, মাঝ শরতে দিন ছোট হয়ে আসছে। একটু এলিয়ে সে চোখ বোলাচ্ছে, এমন সময় কয়েকটা ছায়া তার বইয়ের ওপর পড়ল। তিন্নি আর তিনটি ছেলে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে।

তিন্নি বলল, ইনি হলেন মধুবাবু, এঁর কথাই বলছিলাম। আর মধুবাবু, এরা হল— সায়ন্তন, অভিজিৎ আর তৌফিক, আমাদের কলেজে পড়ে। এরা আপনার সাথে একটু কথা বলতে চায়।... ইতিমধ্যে এদের কথায় রামরতন উঠে বসেছে। মধু তাকে দোকানের ভার দিয়ে তিন্নি আর তার বন্ধুদের সঙ্গে পার্কে গিয়ে বসল।

দু'এক কথার পর তিন্নি বলল, আসলে মধুবাবু আপনি সকালে যেমন রামরতনের সমস্যার কথা ভেবে ম্যাপ খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, আমরাও তেমনি ভারতের সাধারণ মানুষের কথা, তাদের অধিকারের কথা ভাবি। আমাদের মতো ছাত্র-ছাত্রীদের একটা সংগঠনও আছে— 'স্টুডেন্টস ফর ডেমোক্রেটিক রাইটস' বা 'এস.ডি.আর.'। আমরা

ভারতের নানা জায়গার সাধারণ মানুষের ন্যায্য পাওনা/ অধিকারের বঞ্চনা নিয়ে তথ্যসংগ্রহ করি, তা প্রচার করে জনমত গড়ে তুলি, তারপর যতদূর সম্ভব শান্তিপূর্ণ জন-আন্দোলনের মারফত, দাবি আদায়ের চেষ্টা করি। আমাদের মতো এমনই বহু ছাত্র-ছাত্রী সারা ভারতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এই কাজ করে যাচ্ছে। আমরা..., এবার তিন্নিকে থামিয়ে দিয়ে সায়ন্তন বলে, আমাদের কথা পরে শুনলেও হবে, আগে মধুবাবু বলুন, রামরতনের ব্যাপারে আপনি কী ভেবেছেন?

এতক্ষণ এইসব উজ্জ্বল ছেলেমেয়ের কথা শুনতে শুনতে মোহিত হয়ে গেছিল, এইবার একটু সোজা হয়ে বলল, দেখুন, আপনাদের মতো এত বেশি আমি ভাবতে পারি না। তবে, রামরতনদের কাছে পাঠানো নোটিশ পড়ে আগেই বুঝেছি, ওটা প্রাইভেট লিগ্যাল নোটিশ, কোর্ট কিংবা প্রশাসন, কারও অর্ডার নয়, সুতরাং, এব্যাপারে কোর্ট ও প্রশাসন— উভয়েরই হস্তক্ষেপের সুযোগ আছে। তার ওপর আজ দুপুর থেকে 'ফরেস্ট রাইটস্ অ্যাক্ট, ২০০৬' সম্বন্ধে যা জেনেছি, তাতে এই আইনের 'সেকশন ৬' অনুযায়ী, কোনো বনাঞ্চলে বহু যুগ ধরে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর পূর্ণ 'গ্রামসভার' (কেবল গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়) সম্মতি ছাড়া এই ধরনের হস্তান্তর সম্ভব নয়— যদিও গরিব বনবাসীদের এই আইন না-জানার কারণে, আর প্রশাসন ও ব্যবসায়ীদের যোগসাজশে বেশির ভাগ সময়েই উলটোটাই ঘটে, তাও আমি বই পড়ে জেনেছি।...

এবার তিন্নি আর বন্ধুদের মুগ্ধ হওয়ার পালা। অভিজিৎ বলল, সত্যি মধুবাবু, আপনি এত কম সময়ে যেভাবে সমস্যাটা ধরে ফেলেছেন, অনেক বইপত্তর পড়েও অনেকে তা পারবে না। তো, আপনার বিবেচনায় এখন কী দরকার মনে করেন?... মদু বলল, তিনটে জিনিস— এক, নোটিশ-পাওয়া গ্রামগুলোয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রামসভার মিটিং ডেকে এই প্রস্তাব বাতিল করা; দুই, সবাইকে দিয়ে সেই সিদ্ধান্তে সই করা বা টিপসই লাগানো; তিন, কোনো ভালো উকিল বা মুরুব্বি— যে আইন অনুযায়ী কথা বলতে পারবে— তাকে নিয়ে জগদলপুরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচারকের কাছে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের আর্জি জানানো।... সায়ন্তন বলল, আপনি রামরতনকে দিয়ে প্রথম দুটো কাজ করার ব্যবস্থা করুন। জগদলপুরে উকিলের ব্যবস্থা আমরা করছি। ওখানে এইসব মামলা করেন নীলমাধব প্রতিহার। কালকেই ওঁর ঠিকানা, কন্ট্যাক্ট নম্বর যোগাড় করে দিচ্ছি। কিন্তু মধুদা, যদি পারেন, পরশু আপনি রামরতনের সঙ্গে গেলে ভালো হয়।

মধু কিছু বলার আগেই ওরা সবাই এমন তুমুল হর্ষধ্বনি তুলল যে তার কথা চাপা পড়ে গেল।... এরপর একথা থেকে সেকথা— রাজনীতি থেকে সাহিত্য, গান থেকে খুনসুটি, ওই পার্কের ভেতর শরতেই বসন্ত এনে দিল। এদের মধ্যে চুপচুপ ছিল তৌফিক। সে নাকি দারুণ গান লেখে, গান গায়। এক সময় গুনগুন করে সুর ধরল, পরে উদাত্ত গলায়। তিন্নি তাতে গলা মেলাল।...

এরপর ঘটনাক্রম দ্রুত গতিতে বইতে লাগল। নীলম মাথুর প্রতিশ্রুতি মাফিক কুড়িটা জামার জন্য কেবল পাঁচ হাজার টাকা অ্যাডভান্সই দেয়নি, বিধুর সঙ্গে সাপ্তাহিক জামা-

সাপ্লাইয়ের একটা একটা চুক্তিও করেছে। সাক্ষী পবন— বিধুর 'ম্যানেজার'এর পরিচয়ে, সেও চুক্তিতে সই করেছে। এর দুদিন পর, রবিবার সন্ধেয়, মধু রামরতনের সঙ্গে সম্বলেশ্বরী এক্সপ্রেসের জেনারেল কামরায় ওঠে। মাঝে তিন্নিরা এসে মধুকে বাংলা, ইংরেজিতে লেখা আরও কিছু চটি বই, অ্যাডভোকেট নীলমাধব প্রতিহারের ঠিকানা, ফোন নম্বর, আর রাহা-খরচ বাবদ এক হাজার টাকা তুলে দিয়েছে। বলেছে, ওখানকার সব পরিস্থিতি খুঁটিয়ে তথ্যভিত্তিক একটা সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন দ্রুত পাঠাতে, যাকে কেন্দ্র করে ওরা আরও অর্থ চিত্রকূটের মানুষদের জন্য পাঠাবে, আর পুজোর পর ওখানে গিয়ে, জগদলপুর অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রী, সাধারণ মানুষ আর জন-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় সংগঠনগুলোকে নিয়ে একটা যৌথ কনভেনশন করার চেষ্টা করবে।... যাওয়ার আগে পবন মধুকে দু'হাজার টাকা, পুরোনো ব্যাগে কিছু জামাকাপড়, তার পুরোনো মোবাইল, আর নিজের হাতে বানানো গোটা বিশেক লিট্টি দিয়ে দিয়েছে।... আর যাওয়ার দিন সকালে তিন্নি এসে চিত্তপ্রসাদের 'হাংরি বেঙ্গল' এর নতুন সংস্করণ আর শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান' দিয়ে গেছে।...

ছাব্বিশ ঘণ্টার অশেষ দুর্ভোগ-যাত্রার পর ট্রেন যখন সোমবার জগদলপুরে পৌঁছল, তখন মাঝরাত। রামরতনের শালা বাবুরাম স্টেশনে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল, সে জানাল, কাল ভোরের প্রথম বাসে পোটানার, বদনজি, আরও তিনটে গ্রাম থেকে মুখিয়ারা আসবে কাগজপত্র নিয়ে শান্তিনগরের ইন্টারস্টেট বাসস্ট্যান্ডের পাশে সকাল ন'টায়। মধু ঠিক করল, তাহলে তার আগেই উকিলবাবুর বাড়ি যেতে হবে।...

রাতটা স্টেশনের বেঞ্চিতে কাটিয়ে যখন ভোর সাড়ে ছ'টা নাগাদ বার হল, তখন আড়মোড়া ভেঙে চোখ মেলছে সাবেক বস্তার রাজ্যের একদা রাজধানী— এখন বস্তার জেলা আর ডিভিশনের সদর, জগদলপুর। টাটাসহ নির্মীয়মাণ দু'টি ইস্পাত কারখানা এই আদিবাসীপ্রধান শহরে এক নতুন প্রাণচঞ্চলতা এনেছে— বাইরের ব্যবসায়ী, কন্ট্রাক্টারদের দাপট বাড়ছে— শহরও বাড়ছে দ্রুত, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতায়।... প্রায় মিনিট বিশেক হেঁটে, সাহির কিরানা স্টোর আর বোধৎ চৌক পেরিয়ে, তারা বর্ধমান কলোনিতে নীলমাধব প্রতিহারের বাড়ি পৌঁছে শুনল, উকিলবাবু নেই— জব্বলপুর হাইকোর্টে মামলার কাজে গেছেন, ফিরতে বারো তারিখ! শুনে, রামরতন, বাবুরাম ভীষণ মুষড়ে পড়ল। বলে, সবাইকে খবর দেওয়া হয়ে গেছে! ... মধুও হতাশ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু সঙ্গীদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কোই বাত নেহি। ডিএম সাহেবের বাংলো কোথায়?...

মধ্য তিরিশের ডিএম সাহেবের (এখানকার লোকেরা যাকে 'কালেক্টর' বলে থাকে) মা বড় হয়েছেন কলকাতায় আর শান্তিনিকেতনে— তার ওপর দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় তাঁর বহু বাঙালি বন্ধু আর অধ্যাপক ছিল। তাই, সকাল সাড়ে সাতটায় চা আর খবরের কাগজ সামলে ওঠার সময়, যখন তাঁর খাস বেয়ারা এসে খবর দিল যে কলকাতা থেকে এক নাছোড় বাঙালি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়, তখন পাঁচ মিনিট সময় না দিয়ে পারলেন না।... পাঁচ মিনিট অচিরেই পনেরো মিনিট হল। ডিএম

সাহেব এমন মানুষ আগে দেখেননি— যার মধ্যে একাধারে সাবেকি গ্রামীণ সরলতা, আধুনিক প্রজ্ঞা আর আইনি অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশেছে অপূর্ব নম্র দৃঢ়তা!... সব শুনে তিনি বললেন, দেখুন মধুবাবু, আপনি যা চাইছেন দ্যাট মাইট স্টার (stir) আপ আ হর্নেটস নেস্ট— ভেস্টেড ইন্টারেস্ট, মানে কায়েমি স্বার্থ, তার শক্তি কত বোঝেন তো, তবু আমি চেষ্টা করব। ঘণ্টাতিনেক পর আমার সঙ্গে অফিসে দেখা করুন। আর হ্যাঁ, ফরেস্ট রাইটস এর ৬ নম্বর সেকশনের কথা তুলে ভালোই করেছেন, অ্যাপ্লিকেশনে ওটা ভালোভাবে লিখবেন, আর সইসাবুদ করা কাগজপত্রসমেত, মুখিয়াদেরও সঙ্গে আনবেন।...

সাড়ে এগারোটার সময়, পাঁচজন মুখিয়াসমেত মধু যখন কালেক্টরেট থেকে বেরোল, তখন সবাই মধুর নামে জয়ধ্বনি করে উঠল। উৎসাহী কেউ কেউ মালা আর লাড্ডু আনতে ছুটল। একটু আগে, এসপি মারফৎ লোকাল থানার প্রতি অর্ডার সই করতে করতে ডিএম বলেছেন, আগামী পনেরো তারিখ অব্দি ওই পাঁচটা গ্রামে ঢোকার রাস্তাগুলোয় ১৪৪ ধারা জারি করে দিচ্ছি। বারো তারিখে আপনাদের উকিল ফিরলে, তেরো তারিখের মধ্যে জেলা কোর্টে, ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট-এর কথা বলে একটা স্টে অর্ডারের আর্জি জানাতে বলবেন। জজসাব ভালো লোক, আশা করি মাসখানেক 'স্টে' পেয়ে যাবেন। তারপর তো আদালত আর রাজনীতির লম্বা চক্কর। তবে, এরপর কতদিন আমায় এখানে রাখবে, জানি না। সে যাই হোক, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভালো লাগল।...

ফুল-মুষ্টি-জয়ধ্বনির পর, মধু যখন একদিন পরে ফিরে যাবার কথা বলল, তখন সমবেত মানুষ উচ্চধ্বনি ভোটে তৎক্ষণাৎ তা নাকচ করল। আদালতের রায়ের আগে মধুবাবুর যাওয়া হবে না। কিন্তু এ ক'দিন থাকবে কোথায়? এ কথায় সবাই হাত তোলে। কেন, আমাদের গাঁওয়ে!

হপ্তা তিনেক পরে, তিন্নি একটা ভাববাচ্যে লেখা সম্বোধনহীন চিঠি পেল: এখানে 'চলভাষ' (কথাটা সায়ন্তনের) ঠিকমতো কাজ করে না। তাই এই চিঠি, জানি না কবে পৌঁছবে!... গত বুধবার প্রতিহারবাবু আর জজ সাহেবের কল্যাণে মাসখানেকের 'স্টে' পাওয়া গেছে। তারপরেও এরা ফিরতে দিল না। তাছাড়া এদের অবস্থা দেখে আমরাও ফিরে আসতে মন সায় দিল না। বন্ধুদের জানাবেন, এদের নিয়ে একটা ছোট্ট স্কুল গোছের বানিয়েছি— 'আপনা হক্'। সন্ধেবেলা ছোট থেকে বুড়ো— জনাতিরিশ জড়ো হয়। সাধারণ ইংরেজি, পাটিগঠিত, আর দেশের ইতিহাস-ভূগোলের কথা আলোচনা করি। জনস্বাস্থ্য নিয়েও কথা হয়। স্থানীয় দু'তিনজন খানিকটা লেখাপড়া জানা ছেলে আমায় সাহায্য করে। এদের সহায়তায় এখানকার বিশেষ অধিকার সম্বন্ধে জানাতে একটা দু'পাতার লেখা জগদলপুর থেকে ছাপিয়ে এনেছি। হিন্দি আর গোন্ডি, দু'ভাষাতেই। শুনলে হাসি পাবে, তবে এরা আমায় 'মধু মাস্টার' বলে।... শুভেচ্ছা রইল।

দিন দশ পরে মধু চিঠি পেল: "প্রিয় 'মধু মাস্টার', তোমার চিঠি পড়তে পড়তে আমি হঠাৎ ছোটি ঝোড়ায় 'আপনা হক্'-এর কুটিরে পৌঁছে গেছিলাম।..." তিন্নির চিঠিতেই মধু জানতে পারল, নীলম, বিধু আর পবনের নয়া উদ্যোগ বেশ জমে উঠেছে। সামনের মাসে

আইস স্কেটিং রিঙ্ক-এ গারমেন্টস এগজিবিশনে নীলম-বিধু'স সাটিন-কটন কালেকশন' অংশ নেবে। (তিন্নি যা জানে না, তা হল, এর মধ্যে একদিন নীলম আর বিধু 'কফি-কাফ-ডে'তে অনেকটা সময় কাটিয়েছে।) ইতিমধ্যে পবনের চেনা একটা বাড়ির গ্যারেজে পবন-সিধু তাদের কাপড়ের ভাণ্ডারসমেত অল্প ভাড়ায় উঠে গেছে। নিজের দোকানে পবন আর বেশি সময় দিতে পারে না, তাই চেনাশোনা দেশের লোককে বসিয়েছে। শিগগিরি সে একটা সেকেন্ড-হ্যান্ড স্কুটারও কিনবে।... সবশেষে সে লিখেছে: 'নেট ওয়ার্কের সমস্যা এখানেও হচ্ছে। তবে চিঠি লিখতে তো বাধা নেই। এই মোবাইল-ইন্টারনেটের যুগে হাতে-লেখা চিঠি পেতে বেশ লাগে। সপ্রীতি— তিন্নি"।

তিন্নির চিঠি পাওয়ার তিন দিনের মাথায়, সন্ধেবেলায় চারজন মানুষ তার ডেরায় এল। চেহারায় বেশ রুক্ষতার ছাপ। এদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ যে, কথায় দক্ষিণী টান, কোনও ভণিতা না করে বলল, দেখুন মধু মাস্টার, আমরা জানি আপনি ভালো কাজ করছেন— গরিব মানুষের জন্য লড়ছেন, এ ব্যাপারে কিছু কথা ছিল।... ভেতরে ঢুকে ঠাসাঠাসি ঘরে, লোকটা আবার শুরু করে— দেখুন, আমরাও গরিব মানুষের, আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার জন্য লড়ছি। আপনি পড়ালিখ্যা আদমি, নিশ্চয়ই জানেন, দেশের খনিজ আর বনজ সম্পদের ভাণ্ডার যেখানে, সেখানেই আদিবাসী মানুষের বাস। চিরদিন এরা প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে কাটিয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের সময় থেকেই এই সম্পদ লুঠ করা শুরু হয়েছে— দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তা বহুগুণ বেড়েছে। এই বনাঞ্চলের বাইরের লোভী ব্যবসায়ী, রাষ্ট্রশক্তির মদতে দিন কে দিন ফুলে উঠেছে, আর গরিব আদিবাসী শুকিয়ে যাচ্ছে। ভোটে-জেতা নেতারাও আদিবাসীদের কাছে কেবল ভোট চায়, আর নোটের বিনিময়ে লুটেরাদেরই মদত করে। তাই আমরা আদিবাসী ভাইবোনদের নিয়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছি।...

একটানা বলতে বলতে লোকটা হাঁপিয়ে গেলে, পকেট থেকে একটা যন্ত্র বার করে 'পাফ' নেয়, সেই ফাঁকে মধু বলে, কিন্তু লড়াই তো কেবল জঙ্গলে নয়, জীবনের সব ক্ষেত্রেই— তার উপায় খালি বন্দুক হতে পারে না। চাই জন-জাগরণ। সিপাই মিউটিনির পর, ১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইন দেশের মানুষের কাছ থেকে অস্ত্র রাখার অধিকার কেড়ে নিল। তারপর থেকে রাষ্ট্র সশস্ত্র আর জনতা নিরস্ত্র। তাই কেবল হাতেগোনা লোক নিয়ে এত বড় লড়াই চালানো কঠিন। তাছাড়া, জঙ্গলের বাইরেও এক বিরাট ভারত আছে, সেখানেও ভুখা মানুষ, সাধারণ মানুষ, এমনকি লেখাপড়াজানা ভাল মানুষও আছে— যারা 'ন্যায়ের' পক্ষে, তাদের সমর্থনও তো দরকার...।

লোকটা বলল, আপনার কথাটা অনেকটা গান্ধিবাদীদের মতো শোনালেও কিছু যুক্তি আছে। ভাববেন না, আমরা সবাই একরকমই ভাবি। আমাদের মধ্যেও মত আর পথ নিয়ে নানা তর্ক চলে। দু'একদিনের মধ্যে আমরা কাছাকাছি কোথাও বসব। সেখানে আপনার কথাও উঠবে। আজ চলি। আর হ্যাঁ, আপনার কাজে যদি আমাদের কোনও মদত লাগে বলবেন।... বলে কুটির থেকে বেরিয়ে লোকগুলো হাওয়ায় মিশে গেল।... তার ঘণ্টা

দেড়েক পরেই অন্য একদল লোক তার ঘরে ঢুকল, অনেকেরই বয়স বিশের কোঠায়, কারো কারো হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। এদের হয়ে যে কথা বলল, তাকে মধু দূর থেকে চেনে— হনুমন্ত রাও, সরকারি কন্ট্রাক্টর। ভাঁটির মতো লাল চোখ তুলে সে বলল, মাস্টার, আপনি ডিএম সাহেবের মদতে এখানে জমিন দখল আটকে দিয়েছেন, ইস্কুল চালাচ্ছেন— সব জানি। কিন্তু ভুলেও বন-পারটির লোকদের মদত দেবেন না। ওরা দেশের দুশমন। এখানে উন্নতি চায় না। এখানে ইস্টিল প্ল্যান্ট হলে কত আদিবাসী লোগ নোকরি পাবে, তা ওরা চায় না। তাই দেখুন, আদিবাসীরাই ওদের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছে। সরকার ভি এই নেক কামে মদত দিচ্ছে। একটু আগে ওরা আপনার কাছে এসেছিল, জানি। পরশু সাঁঝের বেলায় ওরা ছোটি ঝোড়ার পিছের জঙ্গলে মিটিং করবে, খবর আছে। আপনি বিলকুল ডরবেন না। এখানে চারিদিকে আমাদের লোক আছে। যদি ওরা আবার আসে, তবে আপনি রাস্তার ওপারে চায়ের দুকানে রামাইয়াকে খবর দিবেন...।

লোকগুলো চলে যাবার পর, মধু অনেকক্ষণ বাইরে চোখ বুজে শুয়ে রইল। মাথার ওপরে দশমীর চাঁদ এই বন্ধুর বনভূমির আনাচেকানাচে মায়া ছড়িয়েছে। কাছের ঝিঁঝিঁর ডাক আর দূর থেকে ভেসে আসা ছোটি ঝোড়ার জলপতনের শব্দ মিলেমিশে এক অদ্ভুত সিম্ফনি তুলেছে। কিন্তু মধুর মনে এক উথালপাতাল মন্থন চলেছে।... গ্রামে থাকতে স্কুলে কেবল ভারতের ইতিহাস পড়েছে, কিন্তু 'ভারতবর্ষ' কী, দেখেনি। আর বনবাসী/আদিবাসীদের 'জংলি' ভাবার শিক্ষাই সমাজ আর পাঠ্যপুস্তক দিয়েছে। এমনকি, ইংরেজের সাঁওতালদের বিদ্রোহ দমনেও তখনকার শিক্ষিত বাঙালি 'অসভ্যতার' বিরুদ্ধে 'সভ্যতার' জয়যাত্রার ছবি দেখে, স্বস্তি পেয়েছে। ... প্রশ্ন হল, একটা ভারতের মধ্যে ক'টা ভারত আছে? সল্টলেকের সিটি সেন্টারের থেকে এই ছোটি ঝোড়ার দূরত্ব তো কিলোমিটার বা মাইলের নয়— আলোকবর্ষের! নানা ভারতের এই সমাহার যদি নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা, বন্ধুতার দরজা বন্ধ রেখে দেয়, তবে তার কী যে পরিণতি, তা ভেবে মধু শিউরে উঠল!

এরপরের দু'দিন মধু কেমন চুপচাপ, আনমনা রইল। ওর সঙ্গীদেরও তা চোখ এড়াল না। কেউ কেউ বলল, মাস্টারের ঘরের জন্য মন খারাপ। কেউ কেউ তাকে জগদলপুরে 'সনিমা' দেখে আসারও পরামর্শ দিল। ... এদিকে মহাপৃথিবী কোনো দুর্জ্ঞেয় কারণে দিগ্বিদিকের মেঘ এনে নভ-তলে জড়ো করতে লাগল। ...ছোটি ঝোড়ার আশপাশও চেনা-অচেনা নানা সরীসৃপ আর আগন্তুক মানুষে ভরে উঠল। এমনকি, রামরতনের মতো সরলমতিরও তা নজরে এল। দুদিন পর, কার্তিক পূর্ণিমার দিন দুপুরে, সে মধুর হাত ধরে বলল, বাবু আমিই তোমাকে এনেছিলাম, এখন আমিই বলছি এখান থেকে চলে যাও, আজিই জগদলপুর যাও, যদি পারো রাতের ট্রেনে কলকাতায়।... কিন্তু মধুর যেন ঘোর লেগেছে। সে রামরতনের কথা শুনল, কিন্তু বুঝল না।...

বিকেলে রামরতন যখন মধুর মালপত্তর বেঁধে প্রায় জোর করে তাকে নিয়ে বেরোতে যাবে তখনই আঁধি ধেয়ে এল— এক লহমায় মধুর ঘরের চাল উড়িয়ে নিয়ে গেল। মধুকে দাঁড়াতে বলে, সে ছুটল তার ঘর-বার বাঁচাতে। ... আর মধু ভূতগ্রস্তের মতো তার ভাঙা-ঘরের দাওয়া ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে উল্টোমুখো চলল, ছোটি ঝোড়ার দিকে। এর মধ্যে

রামরতন ফিরে এসেছে, সে মধুর পিছু নিয়ে তাকে ডাকতে লাগল। কিন্তু মধু যেন ঝড় ফুঁড়ে চলেছে। রামরতন হার মানল। একসময় তার চোখের সামনে মধু ছোটি ঝোড়ার পেছনের জঙ্গলে হারিয়ে গেল।... এর কয়েক মুহূর্ত পরে এক মেদিনী-কাঁপানো অগ্ন্যুৎপাতের দৃশ্য-শব্দের প্রাবল্যে সে জ্ঞান হারালো।...

এরপর মধুকে আর কেউ দেখেনি। কেউ বলে, সেদিনের বিস্ফোরণে অনেকের সঙ্গে সেও ছারখার হয়ে ছত্তিশগড়ের জঙ্গলে মিশে গেছে। আর জ্ঞান ফিরলে, রামরতন সীতা মাঈয়ার কসম খেয়ে বলেছে, সে নিজের আঁখে দেখেছে, এক সুনহেরা রথ মে শিরি রাম, সীতা মাঈয়া আর লছমন ভাইয়ের সঙ্গে মধু মাস্টারকে উড়ে যেতে। আর বাংলা সাহিত্যের কিছু পাকা, পোস্টমডার্ন গবেষকের মতে, মধু নাকি বাস্তবের রুঢ়ভূমি ছেড়ে ফিরে গেছে 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে।...

শেষমেশ কী হল, আমরা জানি না। তা ভেবে নেওয়ার দায় আমরা পাঠকদের হাতেই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু একটা প্রাকৃতিক সমাপতনের কথা আলিপুরের আবহবিদরাও অস্বীকার করতে পারেন না।...

সেদিন বন থেকে উদ্‌গত ধোঁয়া উত্থিত হয়ে আশপাশের মেঘমণ্ডলে ছেয়ে গেল। সেই মহামেঘ ছড়িয়ে যেতে লাগল চারিদিকে, ঢেকে ফেলল, মুম্বইয়ের হর্ম্যরাজি আর গ্রিসের এথেন্সে পেনশনের জন্য অপেক্ষমান নিরুপায় বৃদ্ধদের অশেষ লাইন; রামগিরি পর্বত থেকে ম্যানহাটনের টাইম-স্কোয়ার; আফগানিস্তান দুরুমুশকরা মার্কিন বোমারু বিমান থেকে নাইজেরিয়ার ইসলামি-ত্রাস, 'বোকো হারামের' ভয়ঙ্কর লোগো, আরও কত কী...। সেই ঝোড়ো মেঘের দাপটে সল্টলেকের সিটি সেন্টারও এলোমেলো, বিচিত্র হয়ে উঠল।... আর আকাশ থেকে প্রলয়পয়োধি জলধারা নামার আগের মুহূর্তে, সাড়ে তিন দশক আগের এক বাতিল কবিতার খাতা থেকে একটা খয়াটে কাগজ কীভাবে উড়ে হাওয়ায় হারিয়ে গেল। তাতে লেখা ছিল:

... ঘন মেঘ হৃদয়েই ছিল
বৃষ্টি এল উথালপাথাল করে
সাদা সাদা বৃষ্টি এল মশারির মতো
শিউলির বাগানময় সাদা হয়ে যায়
কাক-ডাকা ভোরে মায়ের ডাকের মতো
বৃষ্টি এল মগ্নতা নিয়ে

আত্মগমন বৃষ্টি শিরিষের ডালে ঝোলে
শরীরে অসুস্থ বুক
অনেক সময় বয়ে যায়

শুধু বৃষ্টি পড়ে...